SOC... ...OF INDIA
(West ... Committee)
48, Dh... Street, Calcutta-13.

কংগ্রেসী স্বাধীনতার দুই বছরের সালতামামী

সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী চক্রের পায়ে ভারতবর্ষকে বিক্রয়

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৫৬, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ | মূল্য—দুই আনা

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগষ্ট কেটে গেল; কংগ্রেসী স্বাধীনতা দুই বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। এমনই দিন বিচারের দিন, তাই আজ দেখার সময় এসেছে গত দুই বছরের মধ্যে কিই বা আমরা পেলাম আর কিই বা আমরা হারালাম। প্রশংসা বা বিরুদ্ধতা যে কোন একটা করতেই হবে এমন কিছু বাঁধাধরা কথা নেই; বরং আগে থেকে এই রকম মনোভাব নিয়ে এগুলে বিচারবিশ্লেষণের বদলে বিচারের প্রহসনই হবে। এগুতে হবে আমাদের তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, যেহেতু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। লোক বিশেষের, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তিই হন না কেন, ভাললাগা মন্দ লাগা বিশ্লেষণের মাপকাঠি হলে ভুলের পর ভুলের চোরাগলিতে আটকা পড়তে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন, গত দুই বছরে তাঁরা দশটা বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন; এগুলি তাঁদের "achievements"। দেখা যাক তাঁদের দাবী অনুযায়ী সে দশটি achievement কি কি। (১) স্বাধীনতা অর্জন, (২) পণ্ডিত নেহেরুর আন্তর্জাতিকতার ফলে ভারতবর্ষের সমগ্র এশিয়ার নেতৃত্ব ও সারা বিশ্বে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ, (৩) সর্দার প্যাটেলের স্বরাষ্ট্রনীতির সফলতায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে রক্তপাতহীন বিপ্লব ও ভারতীয় ইউনিয়নে তাদের যোগদান, (৪) দেশ বিভাগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিশেষ করে বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান, (৫) বহিরাক্রমণ ও দেশের মধ্যে শত্রুদের হাত হতে রাষ্ট্রের নিরপত্তা রক্ষা (৬) কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে জয় লাভ, (৭) মুদ্রাস্ফীতি, ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধতা থেকে রক্ষা করে ভারতীয় অর্থনীতিকে দৃঢ় করা (৮) গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা, (৯) রাষ্ট্রের [illegible] ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাঁচিয়ে রাখা, (১০) দেশ বিভাগের পরও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দেশপ্রেমিক শক্তি হিসাবে টিকিয়ে রাখা—এই দশটি হ'ল কেন্দ্রীয় সরকারের মতেই দুই বছর শাসনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্বাধীনতা

এইবার পরীক্ষা করে দেখা যাক এই দাবীগুলি কতদূর সত্য। স্বাধীনতা অর্জন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ শক্তি দেশ শাসনের ভার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাতে দিয়ে বিদায় নিয়েছে সত্য। স্বাধীনতা মিলেছে সত্য; কিন্তু সে স্বাধীনতা কাদের রক্ত মোক্ষণের ফলে অর্জিত হল আর কেই বা তাকে আজ ভোগ করছে দেখতে হবে। গোটা সমাজটাই যেখানে ধনী ও দরিদ্র, শোষক আর শোষিত এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত সেখানে শুধু স্বাধীনতা বললেই হবে না, বলতে হবে কোন শ্রেণীর স্বাধীনতা। শোষকের স্বাধীনতাকে শোষিতের স্বাধীনতা বলে ভাবলে ভুল হবে; কারণ শোষকের স্বাধীনতা হল অসংখ্য মেহনতী মানুষকে শোষণ করে তার নিজের মুনাফা বাড়িয়ে চলার স্বাধীনতা আর শোষিতের স্বাধীনতার লক্ষ্য হল, শোষণকে চূর্ণ করে জনরাষ্ট্র কায়েম করা। এই দুইএর সমন্বয় সম্ভব নয়; এরা পরস্পর বিরোধী, একটি বেঁচে থাকলে অপরটি থাকতে পারে না। সুতরাং ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ চলে গেলই বলে যে সমস্ত জনসাধারণের স্বাধীনতা এসে গিয়েছে এ কথা বলা যায় না যদি না প্রমাণ করা যায় জনতা যার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে তা তাদের করায়ত্ত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন ছিল। পুঁজিপতি, জমিদার, জোতদারের দল চেয়েছিল তাদের শোষণ শুধু অক্ষুন্ন থাকবে তাই নয়, বিদেশী শাসন ভার দেশের ওপর চেপে থাকার জন্য শোষণ করা বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাদের যে প্রতিদ্বন্দীতা চলছিল, যার ফলে তারা অসুবিধা বোধ করছিল তা দূর হয়ে তাদের নিরঙ্কুশে শোষণ চালাবার অধিকার মিলবে। মধ্যবিত্ত চেয়েছিল চাকুরীর সুযোগ ও স্থায়িত্ব, শিক্ষার সুবিধা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুযোগ ও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি। চাষী চেয়েছিল জমিদারী জোতদারী প্রথার বিলোপ, বাঁচার মত নিজের হাতে জমি। শ্রমিকের দাবী ছিল শোষণহীন সমাজে খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচা। আর সকলেই চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত, চাষী ও শ্রমিক যা চেয়েছিল তা আজও পায়নি; সুতরাং ১৫ই আগষ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরকে তারা তাদের স্বাধীনতা বলে ভাবতেই পারে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের আজ প্রশ্ন—যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে স্বায়ত্ত শাসনের প্রভেদ কোথায়? আজও ত ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত! এই যদি স্বাধীনতা হয় তাহলে ১৯৪২ সালের ক্রিপস্ প্রস্তাবের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? ১৯৪৫ সালের ভুলাভাই লিয়াকত ফরমূলাই বা কি দোষ করল? ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের প্রস্তাবকে নাকোচ করে দিয়ে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবই বা নেওয়া হল কেন? ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনই হল তাহলে আজও কোটী কোটী টাকা মুনাফা বিদেশে চলে কেন যায়? কেনই বা ডলার-ষ্টার্লিং সাম্রাজ্যবাদী ফাঁসে ভারতবর্ষ অধীনতায় আবদ্ধ? কুয়োমিনটাং চীন, ফিলিপাইন, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীন হয়েও অর্থনৈতিক অধীনতার দরুণ কার্য্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তাঁবেদারে পরিণত একথা নেতারা অজস্রবার ঘোষণা করেও আজ কেন সেই পথ ধরেই চলেছেন? এর কারণ ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে সে শ্রেণী বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষ করে চলতে চায়। আর আজকের একচেটে পুঁজিবাদের দিনে কোন দেশেরই পুঁজিবাদ বিশেষ করে ভারতবর্ষের দুর্বল ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ইঙ্গমার্কিন একচেটে পুঁজিকে অস্বীকার করে বাড়তে পারে না বরং তাকে সবল হতে হলে তাদের সাহায্য তার প্রয়োজন। তারই জন্য ভারতবর্ষের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে আপোষ করে চলতে চায়। এর ফলে স্বাধীনতা আজ ভুয়া স্বাধীনতায় পরিণত হয়েছে; স্বাধীনতা জনগণের স্বাধীনতা না হয়ে টাটা, বিড়লা সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা হয়েছে।

তার পরে বলা হয়ে থাকে কংগ্রেস স্বাধীনতা এনেছে। কি ধরণের স্বাধীনতা এসেছে সে কথা ছেড়ে দিলেও নির্ভয়ে বলা চলে কংগ্রেস স্বাধীনতা আনেনি এনেছে ভারতবর্ষের সংগ্রামী জনসাধারণ। এই সংগ্রামী জনসাধারণের একাংশ যেমন কংগ্রেসের মধ্যে ছিল অন্য অংশ তেমনই তার বাইরে ছিল। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন কংগ্রেসী আন্দোলন নয়; ১৯৪২ সালের আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেস কোন দিনই নেয় নি আজও নেয় না বরং সেই

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাধারণ নির্ব্বাচনের ধোঁকা

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ঘোষণা করিয়াছে—আগামী ছয় মাসের মধ্যে পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচন করা হইবে। ঘোষণাটি প্রচারিত হইবার পর জনসাধারণ একটু বিস্মিত হইয়াছে বলিতে হইবে; কারণ দীর্ঘ দুই বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কংগ্রেস সম্বন্ধে যে ধারণা তাহারা গঠন করিয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পর্কটা যেন কিছুটা অস্বাভাবিক। সেই জন্য কিছু লোক ইতিমধ্যেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে নেহেরু সরকার এইবার তাহার নীতি পরিবর্ত্তন করিতেছে যেহেতু তাহারা বুঝিয়াছে জনসমর্থন তাহাদের পিছন হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। এই সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে কিছু অংশ আর একটু আগাইয়া গিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যখন সঠিক পথে চলিবার চেষ্টা করিতেছে তখন কংগ্রেসের জনস্বার্থ রক্ষা করা সম্বন্ধে আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করিবার কোন কারণ নাই এবং যদি তাহার মধ্যে কোন ভুলত্রুটী থাকিয়াই যায় তাহা হইলে তাহাকে কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াই দূর করা যাইবে। অন্য দলের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—এই সেদিনও শরত চন্দ্রের জয়লাভের পরও যে কংগ্রেস "ইহাকে জনমতের প্রকাশ বলা যায় না" বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল হঠাৎ তাহার কি প্রয়োজন পড়িল সাধারণ নির্বাচনের? অন্যান্য প্রদেশেও কংগ্রেস প্রার্থীরা পরাজিত হইয়াছে কিন্তু সেখানে সাধারণ নির্বাচনের কোন প্রশ্ন উঠে নাই অথচ পশ্চিম বাংলায় তাহার কি বিশেষ কারণ দেখা দিল? ১৯৫০ সালে যখন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ছিল তখন এই কয় মাসের জন্য কেন পুরাতন ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে নির্বাচন করা হইতেছে? জনতার এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিয়া তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহ দূর করিতে না পারিলে কংগ্রেস সম্বন্ধে তাহাদের মোহমুক্তি ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই!

নেহেরু সরকার যে তাহাদের ধনিক তোষণ ও জনতাকে শোষণ করার নীতি পরিত্যাগ করিয়া জনস্বার্থ রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা ভাবিবার মত কোন কারণই ঘটে নাই যেহেতু তাহার প্রকাশ আজ পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই দেখা যায় নাই। সরকারী তথ্যমতেই জনসাধারণের জীবন ধারণের খরচের মান প্রতি মাসেই বাড়িয়া চলিয়াছে, নামিবার কোন চিহ্নও নাই আর ধনিক শ্রেণীর মুনাফার হার বাড়িয়াই চলিয়াছে; একদিকে অসংখ্য মানুষ অর্দ্ধাহার, অনাহার, বেকারত্ব প্রভৃতির চাপে সংক্রামক ব্যাধির কবলে পড়িয়া প্রাণ দিতেছে অন্যদিকে ধনীর দুলাল পরিশ্রম না করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর মুনাফা লুঠিয়া চলিতেছে। একদিকে নিছক প্রাণ ধারণের সর্বপ্রকার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে নামিয়া সহস্র সহস্র মেহনতী মানুষ কারাগার, লাঠি ও গুলির আঘাতে বুকের রক্ত দিয়া তাহাদের দুর্বহ শোষিত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে অন্যদিকে নগণ্য সংখ্যক পুঁজিপতিরদল সরকারী সাহায্যে সেই রক্তে নিজেদের লাভের কোঠা পূর্ণ করিতেছে। এই নীতির এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই নেহেরু সরকারের; যাহা হইয়াছে তাহা হইল শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তদের উপর নিষ্পেষণের উগ্রতা ও মাত্রা বাড়াইবার বিষয়ে; যেখানে পূর্বে বোঝাইবার অভিনয় করা হইত আজ সেখানে অভিনয়টুকু বাদ দিয়াই গুলির আশ্রয় লওয়া হয়। সুতরাং যদি কেহ ভাবিয়া থাকে কংগ্রেসী সরকার জনস্বার্থ পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সাধারণ নির্বাচন ডাকিয়াছে তাহা হইলে মারাত্মক ভুল করা হইবে।

তবে কেন এই নির্বাচন? এই কথাটি বুঝিতে হইবে। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কংগ্রেস বিরূপতা যে হারে বাড়িয়া চলিতেছিল তাহাতে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা প্রমাদ গণিতেছিলেন; তথাপি তাঁহারা আশা ছাড়েন নাই। কিন্তু দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমতের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়া গেল তাহার পর ওয়াকিং কমিটি আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। আসিলেন কালা বেঙ্কটরাও, চলিল নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের মধ্যে কংগ্রেসী উপদলীয় বিভিন্ন স্বার্থকে জোড়া দিবার চেষ্টা; আসিলেন পণ্ডিতজী, চলি[l] মিথ্যা স্তোকবাক্যের পালা। সর্বরকমে চেষ্টা চলিতে লাগিল জনসাধারণের নষ্ট বিশ্বাসকে আবার কংগ্রেসের প্রতি ফিরাইয়া আনার। কিন্তু নেহেরু চক্র ভালভাবেই জানেন দুর্নীতি পূর্ণ বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসনকে টিকাইয়া রাখিয়া পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগকে আর ভুলাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না অথচ পুঁজিপতি শ্রেণীর এমন বিশ্বাসভাজন সরকারকে হটানও যায় না। তাই একদিকে জনসাধারণকে বলা হইল—"তোমাদের মনোনীত ব্যক্তিরা যাহাতে সরকার গঠন করিতে পারে তাহার পূর্ণ সুযোগ দিবার জন্য সাধারণ নির্বাচন ডাকা হইল." অন্যদিকে যাহাতে কংগ্রেসী প্রার্থীরাই জয়ী হইতে পারে তাহার ষড়যন্ত্র পাকা করিয়া রাখা হইল। অজ্ঞ জনসাধারণ ভাবিল—সত্যইত কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের তাহাদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত করিতে পূর্ণ সুযোগ দিয়াছে; সুতরাং যাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী তাহাদের সমালোচনা ও যুক্তিতর্কের কোন মূল্যই দিতে রাজী হইল না তাহারা। এই ভাবে ধাপ্পা দিয়া জনতার ক্রমবর্দ্ধমান কংগ্রেসবিরোধীতাকে সাধারণ নির্বাচনের ধোঁকা-বাজীতে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা চলিতেছে।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধু ও হুল

এবারকার স্বাধীনতা উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট হল পণ্ডিত নেহেরুর ফতোয়া। প্রধান মন্ত্রী মশাই উপদেশ দিয়েছিলেন, এ বছর স্বাধীনতা উৎসব দিনে প্রত্যেকেই যেন দেশের খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষ রোপন ও হল কর্ষণ করে। এই বাণীর খেউড় গেয়ে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কমিটিও বলেছিলেন—এবারকার উৎসবে সমস্ত বক্তৃতাই হবে "অধিক ফসল ফলাও" সম্বন্ধে। এই সব নেতাদের অধিক খাদ্য শস্য ফলাও সম্পর্কে বক্তৃতাগুলি বেশ ফলাও করে খবরের কাগজগুলিতে প্রচারিত হয়েছে। শুধু কি তাই, গলায় নিভাঁজ চাদর, কোমরে গোঁজা কোঁচা, পায়ে চপ্পল বেশধারী হলকর্ষণরত রাষ্ট্রপাল রাজাগোপাল চক্রবর্ত্তীর ছবিও আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে। নামে রাজা কাজেও রাজর্ষি জনক! এর পর ভারতবাসীর আনন্দ রাখার ঠাঁই কুলালে হয়। তবে প্রভুদের অতীতের কথা আর বর্তমানের কাজ দেখে ভয় হয় নেতাদের হাতে পোঁতা গাছ ও বীজ শুধু শাল আর কচুতে পরিণত না হয়। এই দুটি জিনিষ দিতেই নেতারা সিদ্ধহস্ত এই রকম প্রমাণ জনসাধারণ যথেষ্ট পেয়েছে।

* * *

যাক, পশ্চিমবাংলা সরকার এত দিনে তাঁদের উপযুক্ত কাজ খুঁজে পেয়েছেন বলতে হবে। পশ্চিম বাংলার মৎস্য মন্ত্রী শ্রীযুত নস্কর মশাই হুঙ্কার দিয়ে দাবী করেছেন—"পশ্চিম বাংলায় অধিক জঙ্গল চাই।" সত্যিই চাই; কংগ্রেসী শাসনের দাপটে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের ঘর সংসার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং আপ্ত বাক্য পালন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করা ছাড়া তাদের আর উপায় কি? এই শাস্ত্রীয় বিধি পালনের জন্য বনের প্রয়োজন। নস্কর মশাই জঙ্গল বাড়ালে হতভাগ্য বাঙ্গালীর পরকালের কাজটার অন্ততঃ কিছুটা সুরাহা হয় আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্ত্তা, মন্ত্রী আর কংগ্রেসী চাঁইদেরও সুবিধা হয়। কারণ জন্তু জানোয়ার ও চোরের বনজঙ্গলের প্রয়োজন খুব বেশী; আর ও দুটির কোন অভাবই নেই কংগ্রেসী রাম-রাজত্বের রাম লক্ষণ হনুমান প্রভৃতি গণ্য মান্যদের মধ্যে।

* * *

আমাদের দেশের শাসন কর্তাদের দেশপ্রীতি কি গভীর তা বুঝতে পারা যাবে পণ্ডিত নেহেরুর—"বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী বন্ধ করতেই হবে"—এই কথা হতে। পাছে বিদেশী খাদ্যশস্য খেলে ভারতবাসী বিদেশীয় ভাবাপন্ন হয় এই ভয়ে ভারত-সরকার রাশিয়া থেকে গম আমদানী বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পণ্ডিতজীর মতটা একেবারে মেলে বলে বেশী দাম দিয়ে ১০ লক্ষ টন পচা গম সেখান হতে আমদানী করা হয়েছে। পচা গম খেয়েও যদি ইঙ্গ মার্কিণ চক্রের সঙ্গে সম্প্রীতিটা ভালভাবে না থাকে এই ভয়ে পামেলা মাউন্টব্যাটেনকে করা

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ আমেরিকায় আসন্ন অর্থনৈতিক সঙ্কটের পূর্ব্ব লক্ষণ ★

লেখক : এ, অসিপফ্

ধনতন্ত্রী জগত এক মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি এত চেষ্টা করিয়াও ব্যাপারটি ঢাকিতে পারিতেছে না। মার্কিণ একচ্ছত্র ধনপতিরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছেন। Journal of Commerce পত্রিকায় প্রকাশ যে মার্কিণ অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই বলিয়া মার্কিণ সরকারী মহল যে স্তোক-বাক্য ঝাড়িতেছেন তাহাতে ধনপতি মহল চটিয়া গিয়াছেন। ১৯শে মের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে Wall Street Journal স্বীকার করিয়াছে যে আমেরিকায় আর্থিক সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকায় প্রচণ্ড গতিতে কারখানা, বিশেষ করিয়া যুদ্ধ শিল্প আগাইয়া গিয়াছে। তথাপি ১৯৪৪ সাল হইতে শিল্পের অবনতি আরম্ভ হইল। ১৯৪৬ সালে ১৯৪৩ সালের তুলনায় শিল্পোৎপাদন শতকরা ৩৩⅓ ভাগ কমিয়া গেল। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালের গোড়ায় সামান্য কিছু উন্নতি হইলেও ১৯৪৩ সালের সমান হইতে পারে নাই।

১৯৪৮ সালের শেষার্দ্ধে আবার দ্রুত অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিল। সর্বপ্রথম নিত্য ব্যবহার্য পণ্য দ্রব্য উৎপাদন কমিতে লাগিল। ১৯৪৯ সালের প্রথম তিনমাসে বস্ত্রশিল্প কমিল শতকরা ২৫ ভাগ। পাদুকাশিল্প কমিল শতকরা ২৭ ভাগ। তাহা ছাড়া রবার, কাঁচ, কাগজ, সাবান ইত্যাদি লঘুশিল্প-জাত দ্রব্যও কমিতে লাগিল।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে দেখা গেল ইস্পাতের উৎপাদন শতকরা ৭৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে কমিয়াই চলিয়াছে। পিট্‌স্‌বার্গ, শিকাগো এবং লস এঞ্জেলসের লৌহ শিল্পে কিছু কিছু করিয়া অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হইতে লাগিল। ১০ই জুনের মধ্যে United States Steel Corporation এর ডুগেস্‌নেস্থিত ২৭টি চুল্লীর মধ্যে রহিল মাত্র ৬টি। Alleghaney Loodlum Steel Corporation এর ৪টি চুল্লী নির্বাপিত করায় ২০০০ শ্রমিক বেকার হইল অর্থাৎ শতকরা ১৬ জন ছাঁটাই হইল।

যন্ত্রনির্মান শিল্পেও বিশেষ অবনতি দেখা যাইতেছে। গত বৎসরের তুলনায় উহা এক পঞ্চমাংশে দাঁড়াইয়াছে। জাহাজ নির্মাণ ও ম্যাগ-নেশিয়াম শিল্পের ন্যায় যন্ত্র নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রেও সামর্থ্যের শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ কাজ হইতেছে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রচুর জমা হইয়াছে, অথচ বিক্রয় হয় না। কাজেকাজেই দর পড়িতেছে।

খনি-শিল্পেও সঙ্কট দেখা দিয়াছে। প্রচুর কয়লা জমা হইয়াছে কিন্তু বাজারের অভাব। তামার দাম পড়া এবং চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে বহু তামার খনিতে কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আনাকণ্ডা কোম্পানীর মণ্টানার তামা খনি এবং মিচিগ্যানের কতকগুলি খনি বন্ধ হইয়াছে। Kennekot Copper Corporation মে মাসের শেষ হইতে সাপ্তাহিক কাজ কমাইয়া বেতনের হার কমাইয়া দিয়াছে।

তাহা হইলে একথা বলা অন্যায় হইবেনা যে, মার্কিণ শিল্পের অধিকাংশ শাখাতেই অত্যুৎপাদন সংকট দেখা দিয়াছে।

কৃষিজগতেও সংকটের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ১৯৪৮ সালেই সরকারী কৃষিদপ্তর হইতে চাষীদের আবাদী জমি শতকরা ৮ভাগ কমাইতে বলা হয়: ১৯৫০ সালে নাকি ২কোটি ৭০ লক্ষ টন গম কম হওয়া চাই। তূলা, তামাক, চীনাবাদাম ইত্যাদির চাষও কমাইতে বলা হইয়াছে।

গৃহ নির্মাণ কার্যেও মন্দ গতি দেখা যাইতেছে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে গৃহনির্মাণের জন্য ৫০ কোটি ডলার ব্যয় হয়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্যয় হয় মোট ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। অথচ সেনেট কমিশন পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে ৬০ লক্ষেরও বেশী গৃহ বাসের অযোগ্য হইয়াছে, সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

শিল্পাবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় নিদারুণ ভাবে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ট্রেডইউনিয়ন গুলির মতে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। ইহার উপর আধাবেকারের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। গর্কী বলিয়াছিলেন যে ধনতন্ত্রী শাসনে বেকারত্ব হইল শ্রমিকশ্রেণীর অকাল মৃত্যুর সামিল। আমেরিকাতে আজ লক্ষ লক্ষ লোককে সেই অকাল মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে।

[পৃথিবীর সেরা ধনতান্ত্রিক দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেওয়ার ফলে যেখানে দিনের পর দিন উৎপাদন হ্রাস ও জনসাধারণের দুঃখ, দৈন্য, বেকারত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছে সেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎপাদন বাড়িয়াই চলিয়াছে, জনতার জীবন ধারণের মান উন্নতই হইতেছে, এবং ছাঁটাইএর পরিবর্ত্তে নূতন শ্রমিক নিয়োজিতই হইতেছে। দুইটি ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এই দুই বিপরীত ফলের জন্য দায়ী। আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশে আজ ৬০ লক্ষ পূর্ণ বেকার, ১ কোটী ২০ লক্ষ অর্দ্ধ বেকার। আর "অত্যুৎপাদন সংকটের" ধাক্কায় এক ১৯৪৮ সালের শেষের দুই মাসে ৯০০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়, ১৯৪৯ সালে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২০০টি করিয়া প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাইতেছে; বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ, ইস্পাত ৭৮ ভাগ, তামা, রাসায়নিক, যন্ত্র নির্মাণ শিল্পে উচ্চ হারে কমিয়া যাইতেছে, কৃষিতে আবাদী জমি শতকরা ৮ ভাগ হ্রাস করান হইয়াছে। বিশ্ব সভার বিবরণে দেখা যায় আমেরিকায় শিল্পোৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ এবং যন্ত্র নির্ম্মাণ শতকরা ৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। এই সংকট কিছু সময়ের জন্য কাটাইয়া উঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুদ্ধ বাধায়—আর সেই কারণেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ আর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে সর্ব্বাপেক্ষা সচেষ্ট।

উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা সেখানে এই অবস্থা হইতে বাধ্য কিন্তু সামাজিক সুখ সমৃদ্ধি যেখানে উৎপাদনের লক্ষ্য সেই দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নতই হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাই উৎপাদন হ্রাসের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পায়। ইহার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বমন্দার সময় সোভিয়েট ইউনিয়নে মিলিয়াছে আজও মিলিতেছে। ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালের দ্বিতীয় চতুর্থাংশে সোভিয়েট ইউনিয়নে কাঁচা লৌহের পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ২০ ভাগ, ইস্পাতের শতকরা ২৭ ভাগ, মোড়া ধাতুর শতকরা ৩০ ভাগ, রেশম শতকরা ৩৪ ভাগ, পশম শতকরা ৩৫, জুতা শতকরা ২৮, হোসিয়ারী শতকরা ৩৫ ভাগ। ১৯৪৮ সালের তুলনায় এই বৎসর ইতিমধ্যেই আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে ১৪৮·২ লক্ষ একর। গত বৎসর শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়ে ২০ লক্ষ; এ বৎসর ইতিমধ্যেই আরও ১৬ লক্ষ বাড়িয়াছে।

ভারতবর্ষেও তাহার বিরাট বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সমষ্টিগত ভাবে মানুষের মত বাঁচিবার তাগিদেই বর্ত্তমানের গলিত সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিয়া নূতন সমাজ, নূতন মানুষ, নূতন জীবনের পত্তন করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রস্তুতি ও সংগ্রাম একমাত্র কর্ত্তব্য। **সম্পাদক, গণদাবী**

আমেরিকায় খুচরা ব্যবসারও যথেষ্ট অবনতি হইতেছে। ১৯৪৯ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় ৪৫০ কোটি ডলার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

ধনপতিরা বলেন ষ্টকএক্সচেঞ্জ হইল তাঁহাদের অর্থ-নৈতিক চাপমান যন্ত্র। সম্প্রতি আমেরিকার এই চাপমান যন্ত্রের পারদ আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত দিতেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি কাগজের দাম দিন দিন কমিতেছে। United States Steel Corporation. Bethleham Steel Company, General Motors, Standard Oil, দুপোঁ ইহাদেরও সিকিউরিটির দাম পড়িয়া গিয়াছে। বহু ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালিতেছে। ১৯৪৮ সালের শেষের দুইমাসে ৯০০ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যাইতেছে যে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২০০টি প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাইতেছে।

এই মারাত্মক সংকট হইতে বাঁচিবার জন্য মার্কিণ ধনপতিগণ পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি, মার্শালীকরণ, অস্ত্র নির্মাণ বৃদ্ধির আশ্রয় লইতেছে। কিন্তু তাহাতে সংকট সামান্য পিছাইলেও এড়ান যাইবেনা।

সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান, New York Herald Tribuneএ লিখিতেছেন যে আমেরিকায় আর্থিক সংকট আসিতেছে বলিয়া মার্শাল পরিকল্পনার দ্বিতীয় বাৎসরিক অর্থ যদি এখনই মঞ্জুর না করা হয় তবে বিশ্বসংকটের দায়িত্ব কংগ্রেসকেই লইতে হইবে।

—টাস্

সাধারণ নির্বাচনের ধোঁকা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু বাস্তবিকই কি জনতাকে তাহাদের মনোনীত প্রার্থী পরিষদে পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে? ইহার একমাত্র উত্তর আদৌ নয়। কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেও গণপ্রতিনিধি অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইতে পারেই না। লোক সংখ্যার শতকরা ৯০ জনের বেশীর অর্থনৈতিক পরাধীনতার সুযোগ লইয়া এবং নির্বাচন সংক্রান্ত আইন কানুনে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া ধনিক শ্রেণীই অধিকাংশ আসন দখল করে—এই ঐতিহাসিক সত্যকে ছাড়িয়া দিলেও এক্ষেত্রে বলা যায় প্রকৃত প্রতিনিধি যাহাতে একজনও নির্বাচিত হইতে না পারে তাহার জন্য সমস্ত আটঘাট বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাদিগকে নির্বাচিত করে নাই এরূপ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের লইয়া গঠিত গণপরিষদে ভারতবর্ষের যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হইতেছে তাহার মত গণতন্ত্র বিরোধী গঠনতন্ত্রেও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হইবে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে, যে পাকিস্তান সরকারকে ভারতীয় ইউনিয়নের নেতারা চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করিতে এতটুকু পশ্চাদপদ নন সেই পাকিস্তান সরকারও পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন করিতে যাইতেছে যখন, তখন কিন্তু পশ্চিম বাংলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন হইবে না। কারণ তাহা হইলে যে পশ্চিম বাংলার বিক্ষুব্ধ শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্তের দল কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত জব্দ করিয়া দিবে। এই জন্যেই নিজেদের গৃহীত নীতির মাথায় লাথি মারিয়া বৃটীশ আমলের সর্বজনধিকৃত সাম্প্রদায়িক বাঁচোয়ারা আইন—১৯৩৫ এই অনুযায়ী নির্বাচন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত শাসন আইনে ভোটের অধিকারের ভিত্তি হইল সম্পত্তি, মোটরটাক্স ইনকামটাক্স প্রভৃতি কর ও শিক্ষা; শেষোক্ত খাতে ভোটারের সংখ্যা নগণ্য। ফলে সমাজের শত করা ৮৭ জনের কোন ভোটই নাই। এইভাবে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্তরা ভোট দিতেই পারিবে না আর মিল মালিক, জমিদার জোতদার ও উচ্চমধ্যবিত্ত, জনসংখ্যার শতকরা ১৩ জনের ভোটে যে ধনিক প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হইবে তাহাদিগকেই জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জনতাকে একদিকে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে বলা হইতেছে অন্যদিকে তাহাদের অধিকার কাড়িয়া লইয়া ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিকে জোর করিয়া জনপ্রতিনিধি বলিয়া চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের মোট ৮৪টি আসনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য কেবলমাত্র ৮ টি আসন সংরক্ষিত, ক্ষেতমজুরদের কোন প্রতিনিধিই নাই অথচ নানা প্রতিষ্ঠানের নামে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে ১২টি আসন ধনিক শ্রেণীর জন্য। তবুও বলিতে হইবে জনসাধারণকে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

এত প্রদেশ থাকিতে পশ্চিম বাংলার উপর নজর দিবার কারণ কি? কংগ্রেসী প্রভুরা ভালভাবেই জানেন পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব সর্বাপেক্ষা তীব্র, বাংলায় কংগ্রেসের প্রাধান্য নাই বলিলেই চলে, এইখানেই বামপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। যতদিন যাইবে ততই এই কংগ্রেস বিরূপতা বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইবে না। এইজন্য নিকট ভবিষ্যতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন পরিচালিত করিবার তাঁহাদের কোন ইচ্ছাই নাই। অথচ নির্বাচনকে ধামা চাপা দিয়া রাখিলে অসন্তোষ বাড়িয়াই যাইবে। তাই যদি একবার এখন সাধারণ নির্বাচনপর্ব সারিয়া লওয়া যায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এবং তাহাতে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারে (বর্তমান শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত থাকায় এবং কেবল মাত্র মিলমালিক, জমিদার, জোতদার ও উচ্চমধ্যবিত্তের ভোট দিবার অধিকার থাকায় ধনিক শ্রেণীর দল, কংগ্রেসের, জয়লাভেরই সম্ভাবনা বেশী) তাহা হইলে দেড় বৎসর পরে যে সাধারণ নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে হইবার কথা ছিল তাহাকে অনায়াসেই বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে—এই গূঢ় মতলবে এত প্রদেশ থাকিতে পশ্চিম বাংলায় গলদপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত সীমাবদ্ধ (restricted) ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালিত করিবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে!

এত বাঁধাবাধি করিয়াও কংগ্রেসী শাসন কর্তারা সাহস পাইতেছে না। তাহাদের চোখের উপরই দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীরা কংগ্রেস প্রার্থীকে ধরাশায়ী করিয়াছেন, টা,টা বিড়লা গোষ্ঠির ৪০০০০, (কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যয় সরকারের কাছে দাখিল করা হিসাব মতে; প্রকৃত খরচ আরও অনেক বেশী) বানচাল করিয়া দিয়াছেন; তাই জনকণ্ঠকে রোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় ১৪৪ ধারা আংশিকভাগে উঠিলেও আজিও কলিকাতার চারিপাশের সহরগুলি, ২৪ পরগণা সর্বত্র হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ১৪৪ ধারা প্রয়োগে স্তব্ধ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কণামাত্র নাই—২০টীর মত সংবাদপত্রকে জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কয়েকটির উপর Pre-censorship-এর আদেশ জারী করা হইয়াছে, তিন মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার নিকট হইতে ১১ হাজার টাকা জামানত তলব করা হইয়াছে, তাহার ২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অবৈধ করিয়া রাখা হইয়াছে, অগণিত শ্রমিক কৃষক কর্মীকে বিনা বিচারে বন্দী, অন্তরীন ও আপন প্রদেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বহু আইনানুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন অফিস বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে, কালা কানুন চালু রাখা হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের জন্য যে গণতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা দরকার তাহা এখন কোথায়? এইরূপে নগ্ন ফ্যাসিষ্ট কায়দায় বিরোধী দলগুলিকে পিষিয়া মারিয়া নির্বাচনে অসাধু উপায়ে জিতিয়া জনপ্রতিনিধিত্ব দাবী করার নাম হইল—কংগ্রেসী মতে জনসাধারণকে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া।

মানুষের মত বাঁচিতে হইলে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদের শাসনরূপ পার্লামেন্টারীয় প্রথাকে ধ্বংস করিয়া পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না সম্ভব হইতেছে ততদিন ধনিক শ্রেণী যাহাতে নিরঙ্কুশে শোষণ চালাইতে না পারে তাহার জন্য আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে পার্লামেন্টকে ব্যবহার করিতে হইবে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া। কিন্তু নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইলে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্তদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির উপর হইতে সমস্ত বাধা নিষেধ তুলিয়া লওয়া ও নির্বাচনে প্রত্যেককে সমান সুবিধা দান, কালাকানুন বিলোপ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতির দাবীতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে নচেৎ পশ্চিম বাংলার মেহনতকারী মানুষের ভবিষ্যত অন্ধকারময়।

মধু ও হুল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে শ্রীযুত কৃষ্ণমেননের প্রাইভেট সেক্রেটারী; বড় বড় কমিশনে—তা এই পোড়া দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্যই হ'ক আর ভূগর্ভে ট্রেণ চলাচল ব্যবস্থা পরীক্ষা করার জন্যই হ'ক—সব কিছুতেই হয় ইংরেজ নয় ফরাসী নয়ত মার্কিণ বিশেষজ্ঞরা শোভা পাচ্ছেন। অবশ্য এঁদের পেছনে প্রত্যেকটা বিষয়ে কমপক্ষে কোটী টাকা খরচ হয় এবং এঁদের উপদেশ ভারতের মাটিতে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় কিন্তু তবুও তাতে সম্প্রীতিটা শক্ত হয়, বিদেশে ভারতের মর্য্যাদাটাও বাড়ে। এর পর কার সাধ্য ভারত সরকারের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। জয় গান্ধীজী ও তাঁর plain living and high thinking এর জয়।

* * *

"নতুন কিছু কর রে তোরা নতুন কিছু কর"—কবির কথা। বাংলা সরকার এই নতুন পথ ধরেছেন অধিক খাদ্য ফলাও বিষয়ে। বাংলা দেশে স্বদেশী যুগে বিদেশী দ্রব্য বয়কট সবচেয়ে জোরে চলেছিল। দেশের সেই অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদেশী খাদ্য শস্য আমদানী বন্ধ করে দেশকে খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য পশ্চিম বাংলার প্রচারকর্তা শ্রীযুত অমল হোম এক আদি ও অকৃত্রিম দেশী উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আবিষ্কারটা অনেক দিন আগের হলেও বর্ত্তমানে তাকে কার্য্যকরী করা হবে শোনা যাচ্ছে। দশ হাজার টাকা শ্রীমতী সাধনাবোসকে দেবার সর্ত্তে নৃত্যবহুল একটা চলচ্চিত্র তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে কৃষকদের "অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" আন্দোলনে উৎসাহিত করার জন্য। এই রকম উর্বর মস্তিষ্ক যাঁর তাঁকে ছেড়ে রাখলে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ট্রপিকাল বিভাগের কাজ বেড়ে যাবে। সুতরাং পশ্চিম বাংলা সরকারের উচিত হোম সাহেবের জন্য কোন শীত প্রধান অঞ্চলে নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা। তবে হোম সাহেবের উন্নতি যে অবধারিত তাতে কোন সন্দেহ নেই কারণ শ্রীমতীর ছবি দেখে চাষীরা উৎসাহিত না হলেও তাঁকে কেন্দ্র করে মধুগুঞ্জন করতে সরকারী হোমরা-চোমরা কর্ত্তা ব্যক্তিরা যে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করবেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা বলি, জিনিষটা ত্রুটীহীন হয় যদি শ্রীমতীর নাচের সঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থক কংগ্রেসী নেতাদের মুখে "ছিঃ ছিঃ এতো জঞ্জাল" গানটা লাগিয়ে এবং তার সঙ্গে মন্ত্রী বিরোধী কংগ্রেসীদের কেচ্ছাগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়। এতে প্যাটেল-সীতারামিয়া প্রভৃতি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কংগ্রেসের আত্মসমালোচনা পর্বটা চুকে যায় আর মন্ত্রীত্বের সাফাইও গাওয়া হবে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার এমন সুযোগটা নষ্ট করা উচিত কিনা রায়, বর্তমান সরকার মন্ত্রীমণ্ডলী, ভেবে দেখতে পারেন।

কংগ্রেসী সরকারের বাস্তুহারা সাহায্যের নমুনা

কংগ্রেসকর্ম্মীর ৪৫০৲ টাকা আত্মসাৎ

মিথ্যা নামে সাপ্তাহিক খয়রাতি গ্রহণ ঃ কংগ্রেসী নেতাদের ঘটনা চাপাদিবার অপচেষ্টা

সংবাদে প্রকাশ বনগ্রাম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসী কর্ম্মী অমূল্য রতন কর রিলিফ অফিসারের নিকট হইতে যতীন ভট্টাচার্য্য, নিশিভূষণ দাস ও উষারাণী দত্তকে একত্রে ১৩৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়াইয়া দেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে বনগ্রাম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে উষারাণী দত্ত নামে কোন আশ্রয় প্রার্থী কোনদিনই ছিল না এখনও নাই। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শ্রীযুক্ত কর মহাশয় নলিনীবালা দাসীকে উষারাণী দত্ত সাজাইয়া, মিথ্যা বণ্ড ও টিপ সহি করাইয়া ৪৫০৲ টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন। উপরন্তু তিনি উক্ত উষারাণী দত্তের নামে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক খয়রাতি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। জানা গিয়াছে এই ঘটনা সাহায্যমন্ত্রী নিকুঞ্জ মাইতি, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসী পরিষদ দলের সম্পাদক শ্রীহেমন্ত কুমার বসু, বনগ্রাম কংগ্রেস সভাপতি ও মহকুমা হাকিমের কাছে লিখিতভাবে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই।

পাইকপাড়ায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের ইউনিট গঠন

গত ১৮ই আগষ্ট, ৬৭।১ বি, টি, রোডে 'প্রগতি পাঠচক্র' গৃহে কমরেড নাহার মুখার্জীর সভাপতিত্বে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্মী ও সমর্থকদের এক সভা হয়। সভায় কমরেড নির্ম্মল রায় চৌধুরীকে ইউনিট-ইন-চার্জ করিয়া একটি শক্তিশালী ইউনিট গঠিত হয়।

পশ্চিম বাংলা সরকারের কৃষক দমনের নূতন কৌশল

অর্ডিন্যান্স করিয়া কমমূল্যে ধান কাড়িবার চেষ্টা

চাষীর নিকট প্রতিমণ ৭৷৷০ দরে ক্রয় কিন্তু সরকারের চালের দাম প্রতিমণ ১৭৷৷০

পশ্চিম বাংলা সরকার নূতনভাবে কৃষক দমনের চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। গত ৬ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিম বাংলার জনসংভরণ মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন, পশ্চিম বাংলায় বাধ্যতামূলক ভাবে খাদ্য সংগ্রহ নীতি অবলম্বনের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারীর কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহার জোরে প্রত্যেক চাষীর নিকট হইতে সরকার ইচ্ছা করিলেই খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সরকারের বর্ত্তমান খাদ্য নীতির লক্ষ্য গরীব চাষীকে জব্দ করা; কারণ সরকার চাষীর নিকট হইতে প্রতিমণ ধানের জন্য ৬৷৷০ হইতে ৭৷৷০ টাকা দাম দেন অথচ প্রকাশ্য বাজারে ধান প্রতি সের ।৫ বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। অর্থাৎ সরকারীমতে বাজারে সেখানে দাম প্রতি মণ ১০৷৷০ র বেশী সেখানে চাষী পাইবে সর্ব্বোচ্চ ৭৷৷০। শুধু তাহাই নয় সরকারের রেশনের চালের দাম প্রতিমণ ১৭৷৷০। দেড় মণ ধানে স্বভাবত ১ মণ চাল হয়। সুতরাং রেশনের চালের দাম অনুযায়ী সরকার প্রতিমণ ধান জনসাধারণকে ১১৸০ দরে বিক্রয় করিতেছেন। বর্ত্তমানে আবার আকাঁড়া চাল বিক্রিত হইতেছে। ইহাতে দেড় মণ ধানে এক মণের বেশী চাল উৎপন্ন হয়। সুতরাং কমপক্ষে সরকার প্রতিমণ ধানে ৪৷৷০র মত লাভ করিতেছেন। এই নীতির ফলে চাষীকে একদিকে কম দামে ধান বিক্রয় করিতে বাধ্য করান হইতেছে অন্যদিকে তাহাদিগকে বাজার হইতে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কিনিতে হয় তাহার দাম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বাংলার চাষী মুমূর্ষু; তাই তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই সরকারের ধান চাল ক্রয় নীতির প্রতিবাদ করিতেছে। সেই প্রতিবাদকে চূর্ণ করিবার জন্য এই অর্ডিন্যান্সের আমদানী। বাঁচিতে হইলে চাষী ভাইদের এই জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে কর্ম্মচারী ছাঁটাই

আট দশ বৎসরের বেশী পুরাতন কর্ম্মচারীদেরও নিষ্কৃতি নাই

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বহু কর্ম্মচারীকেই বিনা কারণে ছাঁটাই করা হইতেছে; এই সমস্ত বরখাস্ত কর্ম্মচারীদের অনেকেরই চাকুরী আবার ৮।১০ বৎসরেরও অধিক। স্মরণীয় বিষয় এই যে, গত বৎসর এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসের কর্ম্মচারীদের মিলিত ধর্ম্মঘটের সময় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে এই আশ্বাস দেয় যে, বর্ত্তমানে কোনরূপ ছাঁটাই করা হইবে না; অথচ এখন সে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই সরকার পক্ষ দিতে রাজী নয়।

গত ১৩ই আগষ্ট আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কন্‌ট্রোলার অফিসের ৬ জন কর্ম্মচারীকে কোন কারণ না দেখাইয়াই বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং শোনা যাইতেছে আরও ৬০ জনের মতকে ছাঁটাই এর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। শুধু উপরোক্ত অফিসেই নয়, এই মাসের মধ্যে আমেরিকান সারপ্লাস ষ্টোর্স ইউনিটের ৬২ জন কর্ম্মচারীকে অনুরূপভাবে ছাঁটাই করা হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে ষ্টোর্স একাউণ্টস অফিসে ৭ জন কর্ম্মচারীকে জবাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মচারীদের সংঘবদ্ধ দাবীর ফলে তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করা হয়। কমার্শিয়াল ষ্টাটিস্টিক্স এণ্ড ইণ্টেলিজেন্স অফিসেও ১০০ জন কর্ম্মচারীকে ছাটাই করার চেষ্টা করা হয় এবং সেখানেও কর্ম্মচারীদের সংঘবদ্ধ বিরোধীতার জন্য ছাঁটাই আদেশ স্থগিত রাখা হইয়াছে। সেন্ট্রাল ষ্টেশনারী এবং সেন্ট্রাল একসাইজ এণ্ড ল্যাণ্ড কাষ্টমস্ অফিসেও এই একই ধারা চলিতেছে।

নগ্নভাবে ছাঁটাই এর চেষ্টা করিলে কর্ম্মচারীরা বাধা দেয় বলিয়া বর্ত্তমানে কৌশলপূর্ণ উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি, প্রমোশন কমিটি, ক্লাসিফিকেশন কমিটির মারফৎ ব্যয় সঙ্কোচ ও যোগ্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে প্রচণ্ড ছাঁটাইয়ের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। দেশে যখন পুঁজিপতিদের তোষণের জন্য সহস্র সহস্র যুবক কর্ম্মহীন বেকার অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছে তখন নূতন করিয়া ছাঁটাই এর নীতি কংগ্রেসী সরকারের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রেরই প্রমান দেয়।

গণদাবী পরিচালকের নিবেদন

গণদাবীর গ্রাহক, সমর্থক ও অনুগ্রাহকদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে প্রেস সংক্রান্ত গোলযোগের জন্য এতদিন আমরা আমাদের পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমরা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। বর্ত্তমানে পরিবেষক প্রেসের সহিত চুক্তি অনুযায়ী আশা করা যায় এখন হইতে গণদাবী নিয়মিত ভাবে ও সময় মত বাহির হইবে। আশা করি পূর্বের মত সাহায্য সমর্থন ও সহানুভূতি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

রথীন সেন
১এ, একজিবিশন রো।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকারের আদেশে ২৫০০ লোক বাস্তুচ্যুত

চারি বৎসর জমিচ্যুত হইয়া আন্দোলনের পর ৪০ টাকা প্রাপ্তি

হরিণঘাটার চাষীদের উপর সরকারের নয়া আক্রমণ

গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে নদীয়ার জিলা মেজিষ্ট্রেট হরিণঘাটা অঞ্চলের দশটি মৌজার প্রজাদের উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ২৫শে আগষ্টের মধ্যে তাহাদিগকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে। এই আদেশের ফলে পাঁচশত পরিবারের ২৫০০ চাষীকে বাস্তুচ্যুত হইতে হইবে।

গত ১২৪৫ সালে চাষীদের যে জমি সরকার পক্ষ রিকুইজিশন করিয়া লন তাহার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও কোন ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় গত জানুয়ারী মাসে আন্দোলন করার পর বিঘা প্রতি ৪০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ তাহাদের দেওয়া হয়। সুতরাং সরকারী আদেশে বাস্তুচ্যুত হইলে তাহাদিগকে যেখানে ২০০৲৩০০৲ টাকা করিয়া প্রতি বিঘা জমি কিনিতে হইবে সেখানে ৪০৲ টাকা লইয়া তাহারা কি করিবে? উপরন্তু গৃহ নির্ম্মানের জন্য যে ব্যয় তাহাই বা তাহারা কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? মাঠে ধান ও পাট পৌষ মাঘ মাস পর্য্যন্ত থাকে, অথচ ২৫শে আগষ্ট তারিখের মধ্যে জমি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইলে ফসলের কোন মূল্যই মিলিবে না। এই ভাবে আদেশের জোরে ৫০০ কৃষক পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকার গৃহহীন, অর্থহীন, অন্নহীন অবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন। অথচ গত জানুয়ারী মাসে চাষীদিগকে কৃষিমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া জিলা মেজিষ্ট্রেট, পুলিশ বড়কর্ত্তা, জিলা কংগ্রেস সভাপতি প্রত্যেকেই আশ্বাস দিয়াছিলেন উদ্বাস্তু চাষীদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে। দরিদ্র চাষীদের ধাপ্পা দেওয়া ও তাহাদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে সরকারের একমাত্র নীতি।

জমিদার ও কলওয়ালাদের স্বার্থে জনতার গলায় ছুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনে জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে মুছে ফেলে দিতে চায়, আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছে কংগ্রেস। এর পরে নৌবিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান, এয়ার ফোর্সের ধর্ম্মঘট, পুলিশ বাহিনীর ধর্ম্মঘট, গুর্খাবাহিনীর বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন যে সমস্ত গণউত্থানের আঘাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম পাদ কেঁপে উঠেছিল তার কোনটারই সমর্থন করে নি কংগ্রেস; উপরন্তু সেইগুলির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আপোষ আলোচনায় ক্ষমতা দখল করেছে। অথচ এদের আত্ম ত্যাগে ও আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে পড়ে বৃটিশ-শক্তিকে ভারতবর্ষ দৃশ্যতঃ ত্যাগ করতে হয়েছে। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন কংগ্রেসের জন্য সম্ভব হয়েছে এই আত্মপ্রসাদ ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয় আদৌ।

বিশ্বের দরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি

নেহেরুর আন্তর্জাতিকতার দৌলতে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে সম্মানের স্থান লাভ করেছে, না সাম্রাজ্যবাদী চক্রের লেজুড় হিসাবে চলতে বাধ্য হয়েছে তা বিচার করতে গেলে বেশীদূর যেতে হবে না। বহুবার কি ভারতীয় পার্লামেণ্ট কি কংগ্রেসী বক্তৃতা মঞ্চ হতে ঘোষণা করা হয়েছে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি হল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ে, আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকবারই সে জাতিসংঘে ইঙ্গমার্কিন ব্লকে অন্ধের মত ভোট দিয়েছে। এ অবস্থা হতে বাধ্য; কেন না কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর। কোন দেশ যদি পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি পুঁজিবাদী হয় তাহলে বিশ্বপুঁজিবাদের সহিত তাকে মিলিয়ে চলতেই হবে। তাই মুখে নিরপেক্ষতার কথা বলেও প্রত্যেক ব্যাপারে ইঙ্গমার্কিন পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী চক্রে ভারতীয় রাষ্ট্র যোগ দিয়েছে। কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য তুলে নিতে হবে এ প্রস্তাব যখন জাতি সংঘে উঠেছিল ভারতীয় প্রতিনিধি ইঙ্গমার্কিন দলে যোগ দিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন, এশিয়ায় বিদেশী পুঁজি রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে না সোভিয়েট প্রতিনিধির এই ন্যায় সঙ্গত দাবী ভারতীয় প্রতিনিধিকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস ও যুদ্ধের কাজে এটম বোমা ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব বানচাল করতে এগিয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সহযোগিতায়, মালয়, ভিয়েৎনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ, ফরাসী, ও ওলন্দাজ নির্যাতনের কোন কার্য্যকরী বিরোধীতাই করেনি ভারতবর্ষ বরং মালয়বাসীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বৃটিশ শক্তিকে নেপাল হতে গুর্খা সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করেছে; মহাচীনের মুক্ত এলাকাকে ইঙ্গমার্কিন শক্তি স্বীকার না করলে ভারতবর্ষ স্বীকার করতে পারবে না বলে জানিয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সামরিক শলা-পরামর্শ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়, ভারত রক্ষার ব্যবস্থা এট্‌লি বেভিন দ্বারা সম্পাদিত হয়, ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে নতুন নতুন বৃটিশ সামরিক অফিসারের নিয়োগ হয়ে চলেছে। আজও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে কেন ভারতবর্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে নি? কেনই বা এখনও ভারতবর্ষের বুকে পর্ত্তুগিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত? কেনই বা ভারতীয় প্রত্যেকটি পররাষ্ট্র দৌত্য বিভাগ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ও ইঙ্গমার্কিন প্রশংসায় পঞ্চমুখ? এরই নাম কি নিরপেক্ষতা? এই হল নেহেরুর আন্তর্জাতিকতা। এর নাম আন্তর্জাতিকতা নয়; এ হল সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের তাঁবেদারী। বিশ্বের দরবারে এতে সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়েনি। বরং শক্ত হয়েছে গোলামীর ফাঁস।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে রক্তপাতহীন বিপ্লব

ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে প্রজা আন্দোলন হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত মধ্যযুগীয় শোষণ ভারে দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণ নিষ্পেষিত হচ্ছিল তা থেকে মুক্তি তারা চেয়েছিল। এরই জন্য কৃষক-প্রজা-মজদুররাজ ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের লক্ষ্য এই কথা ক্ষমতা দখলের আগে নেতারা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন প্রজাসাধারণকে তাঁদের পিছনে টেনে আনার জন্য। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হল কি হল না এ প্রশ্নের চেয়ে বড় প্রশ্ন হল দেশীয় রাজ্যের প্রজারা জায়গীরদার প্রথা বেগারপ্রথা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত হল কি না, তাদের বাঁচার মত দাবী স্বীকৃত হল কিনা। সর্দার প্যাটেলের কঠোর স্বরাষ্ট্র নীতির ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার ফলে প্রজা-সাধারণের কোন উন্নতিই হয় নি। যে রাজা, মহারাজা, নবাব বাহাদুরের দল স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রজাদের নির্বিচারে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি তারাই আজ হয়ে উঠেছে দেশপ্রেমের জলন্ত প্রতীক কংগ্রেসী নেতাদের চোখে আর যে জনসাধারণ নিজের বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখে গেল তারা হল উচ্ছৃঙ্খল জনতা। তাই জায়গীরদারী বাঁচিয়ে রেখে, নিজামী অক্ষুণ্ণ রেখে ও রাজা, মহারাজার দলকে রাজপ্রমুখ উপরাজ প্রমুখ প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করে লক্ষ লক্ষ টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর অন্য দিকে চাষের জমি দাবীকারী চাষীকে নির্বিচারে গুলি করে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হচ্ছে। এক প্যাটেলজীর স্বাধীন রাজস্থানে জয়পুরের মহারাজাকে ১৮ লক্ষ যোধপুরকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার, বিকানীরকে ১৭ লক্ষ, মেবার ও কোটার মহারাজকে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৭ লক্ষ বার্ষিক সেলামী দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এঁরা হলেন বড় বড় রাজা বাদশার দল, এরা ছাড়া আরও ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার বরাদ্দ আছে ছোট ছোট রাজা রাজড়াদের জন্য। এইত গেল রাজা মহারাজদের অবস্থা। প্রজাদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চাপে প্রজারা মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল তার ওপর শুল্ক প্রভৃতি বাধা নিষেধ দূর হয়ে যাওয়ায় পুঁজিবাদী শোষণও চেপে বসেছে। ফলে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চাপে তারা পিষ্ট। ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে উড়িষ্যার রাজ্যগুলিতে যেখানে প্রতি মন চালের দাম গড়ে ৫৲ টাকা থেকে ৬৲ টাকা ছিল আজ তা চড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৲ হতে ২৫৲ টাকায়। শুধু খাওয়ার এই অবস্থা তা নয়, পরা ও থাকার সেই অবস্থা। কাপড়ের দাম সাধারণের ক্রয়ের বাইরে, তেলের অভাবে গাছের ডালে মানুষকে বাসা বাঁধতে হয়—এ কথা বর্ত্তমানের কংগ্রেসী সরকারের পুলিশেরই রিপোর্ট। এর নাম রক্তপাত হীন বিপ্লব দেওয়ার বদলে প্রতিবিপ্লবের মহড়া বলাই বেশী যুক্তিসঙ্গত।

বাস্তহারা সমস্যা

ক্ষমতা দখলের আগে নেতাদের যখন শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন পড়েছিল জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রবেশ করিয়ে তাদের ধর্ম্মান্ধ করে তোলার তখন বর্ত্তমানে যাঁরা বাস্তহারা তাদের বলা হয়েছিল দেশ বিভক্ত হবার পর তারা বাসস্থান পাবে, কাজ পাবে, জমি পাবে, ভালভাবে বাঁচার সবরকম সরঞ্জাম তাদের মিলবে। তারপর জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আপোষের খিড়কির দোর দিয়ে ক্ষমতা যখন করায়ত্ত হল তখন ভেসে গেল আগের সে সব প্রতিশ্রুতি, ভেসে গেল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। ভেসে তারা, শুধু গেল না, একেবারেই গেল। গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বানের জলে শেওলার মত ৫৫ লক্ষ সাধারণ ভারতবাসী ভেসে চলল। গন্তব্যস্থল তাদের নেই, পথই তাদের আস্তানা। যা কিছু তাদের ছিল তা রইল অন্য দেশে, যা কিছু আনতে চেষ্টা করল পথে তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ভারতীয় ইউনিয়নে বাস্তহারা হয়ে দিন গুজরাতে হল। সরকারী মতে ৫৫ লক্ষ; প্রকৃত সংখ্যা এর কত গুণ কে তার হিসাব রাখে। এর মধ্যে ৮ লক্ষের মত বাস্তহারা পুনর্বসতি শিবিরে স্থান পেয়েছে; কিন্তু তাকে পুনর্বসতি ব্যবস্থা বললে অনেক বেশী সম্মান দেওয়া হয়। এই সবহারাগণের দল যখন থাকার জায়গা, কাজ, জমি, বাঁচার সরঞ্জাম চাইল তখন তাদের কপালে জুটলো নির্য্যাতন আর জুলুম। কেন্দ্রীয় সরকার দম্ভভরে

একদিকে মুনাফার পাহাড় অন্যদিকে অনাহার ও মৃত্যু

প্রচার করেন বাস্তুহারাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে; তাদের পুনর্বসতির জন্য ১৬ কোটী টাকা খরচ করা হবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই টাকা কাদের পেছনে ব্যয়িত হচ্ছে? বাস্তুহারাদের জন্য না সরকারী পুনর্বসতি বিভাগ পোষণের জন্য। "পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসংখ্য পরিবার না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াচ্ছে", "নিরন্ন বাস্তুহারাগণ পেটের জ্বালাতেই তাদের প্রিয়তম সন্তানদের পর্য্যন্ত আজ রাস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে; এখানে পিতা-পুত্র-কন্যা কোন সম্বন্ধ নেই"—এ সব কথা কংগ্রেসী সংবাদ পত্র গুলি প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে অথচ পুনর্বসতির নামে কোন বিশেষ মন্ত্রী মহাশয়ের শ্যালক মোটা বেতনে নিযুক্ত হচ্ছে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বাস্তুহারার নামে সাহায্য নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে। এই হল বাস্তুহারা সমস্যার সুষ্ঠু সরকারী সমাধান। হিসাবে দেখা গিয়েছে এই বাস্তুহারা পরিবারের শতকরা ৫০ জনের মত কৃষিজীবি, ৩৫ জন ব্যবসায়ী এবং বাকি বুদ্ধিজীবী। ভারতীয় ইউনিয়নে যে পরিমান পতিত জমি আছে এবং যে পরিমান জমি মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে তাতে এই উদ্বাস্তু চাষীদের ভালভাবে প্রতিপালিত করা যায়; প্রত্যেক পরিবার ৬ একরের মত চাষের জমি পেতে পারে অথচ তা না করে যে সমস্ত জমিদার জোতদারের পাকিস্থানে জমি ছেড়ে আসতে হয়েছে তাদেরই মধ্যে বিলি করা হচ্ছে এই সব পরিত্যক্ত ও পতিত জমি। এক দিল্লীর কথাই ধরলে দেখা যায় মোট ৫৫৬০ একর পরিত্যক্ত জমির মধ্যে কেবলমাত্র ৫৪০ একর বাস্তুহারারা চাষ করেছে বাকি জমি পতিত অবস্থায় আছে, কিছু জমি জমিদার কর্ত্তৃক ভাগ চাষে বিলি হয়েছে এবং ২৫০০ একর বাস্তুহারা নয় এই রকম সমৃদ্ধ ধনী প্রজারা বেআইনী ভাবে ভোগ দখল করছে। এ অবস্থা শুধু দিল্লীতে নয়, পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলায়ও এই। শেষোক্তটিতে অবস্থা আরও সঙ্গীন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য সেখানে কিছু নেই বললেই চলে। এর পরও বলতে হবে বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান হয়েছে?

নিরাপত্তা রক্ষা

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা বলে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রচার করা হয়ে থাকে সারা ভারতবর্ষে আজ জরুরী অবস্থা এবং জরুরী অবস্থায় গণতন্ত্রের কথা তোলা বাতুলতা। প্রথমতঃ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এমন কোন অবস্থা নেই যাতে তাকে জরুরী বলে ঘোষণা করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে নির্ভুলভাবে প্রমানিত হয়েছে অসংখ্য ঘটনার দ্বারা যে, যারাই বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসনের সমালোচনা করবে তাদেরই স্থান হবে কারাগারে। অর্থাৎ কংগ্রেসী নেতারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার নাম করে সরকার বিরোধী প্রত্যেকটি শক্তি নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র জনসাধারণের সমষ্টিগত সুখ সুবিধা ও শান্তির জন্য, জনসাধারণ রাষ্ট্রের জন্য নয়। সুতরাং জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্র রক্ষার কথা বলা এবং দাবী করা পরিষ্কার ধাপ্পাবাজী। ভারতীয় রাষ্ট্র সেই পথই ধরে চলেছে।

হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর সমস্যা

হায়দরাবাদে যে বিরাট গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল তার মূলে আছে সেখানকার ভূমি ব্যবস্থার চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্রের নির্ম্মম শোষণ। দেশমুখ, জায়গীরদার ও নিজামের অনুচরদের অধিকারে সমগ্র রাজ্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ জমি, নিজামের মাসিক আয় ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা, একা নিজাম কৃষি হতে বছরে লাভ করেন ৫ কোটী টাকা অথচ প্রজারা ঋণদায়ে আবদ্ধ, বেগারী প্রথা, বে-আইনী খাজনা, পুলিশি অত্যাচারে জর্জরিত, বিনা কারণে জমির সত্ব হতে বঞ্চিত। এই প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য হায়দরাবাদের অধিবাসীরা অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করেছে, অসংখ্য প্রজা প্রাণ দিয়েছে অথচ কংগ্রেসী সরকারের হায়দরাবাদ অভিযানের পর সেই সমস্ত প্রজাদের কম্যুনিষ্ট বলে নির্বিচারে ফাঁসিকাঠে চড়ান হচ্ছে আর নিজামকে নিরাপরাধ বলে নিজামী রক্ষা করা হচ্ছে। এই হল হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান। আর কাশ্মীর সমস্যার সমাধান বহুদিনই স্থিরিকৃত হয়ে আছে। কাশ্মীর বিভক্ত হবেই হবে। বিড়লার Eastern Economist বহুবার সেই উপদেশ দিয়েছে ভারত সরকারকে, আজকের cease fire line, partition line য়ে পরিণত হতে চলেছে।

মুদ্রাস্ফীতি

প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিনিষপত্রের দাম কমা উচিত। অথচ এখনও প্রতি মাসে তা বেড়েই চলেছে। ১৯৪৮ সালে দ্রব্য মূল্যমান জানুয়ারী মাসে যেখানে ৩২৯২ পয়েন্ট ছিল, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে তা হয়েছে ৩৭৬, জুলাইয়ে আরও ৩ পয়েন্ট বেড়েছে। জীবনধারণের এই খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে মজুরী তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলায় শ্রমিকদের আসল মজুরী কমেছে শতকরা ২১·৯ ভাগ, বিহারে শতকরা ৩৯·৭ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে শতকরা ২৩, বোম্বাই প্রদেশে শতকরা ২·৬ ভাগ। অথচ মিলমালিকের বেলায় প্রত্যহই মুনাফা বেড়েই চলেছে। নীচের হিসাব তার প্রমাণ।

শিল্পে মুনাফাসূচক

(১৯২৮=১০০)

বছর	চটকল	সূতাকল	চা	চিনি	লোহা ও ইস্পাত	কয়লা	সমস্ত শিল্প মিলিয়ে
১৯৩৯	১৩·৬	১৫৪·৫	৯৬·২	১৭৯·৪	২৮৯·৩	১৩৯·১	৭২·৪
১৯৪৬	৫৮·১	৬৮০·৫	১৯০·৪	১৭৫	৩২৪·৭	২৭৮·৮	১৫৯·৪

(ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট বাৎসরিক সংখ্যা ১৯৪৮)

এই চড়া মুনাফা বজায় রাখার জন্য একদিকে চলে বলে কৌশলে উৎপাদন হ্রাস করা হচ্ছে অন্য দিকে রেশানালাইজেসন প্রথা চালু ও শ্রমিক ছাঁটাই করে যাওয়া হচ্ছে।

উৎপাদন

(১৯৩৯=১০০)

বছর	তুলাজাত	চট	ইস্পাত	কাঁচা লোহা	সিমেণ্ট	চিনি	বিদ্যুত	গড়শিল্প
১৯৪৭	১৩২·২	১০০	১৩১·২	৮৩·৯	১২৮	১২৫·২	১৬৭·৫	১২০
১৯৪৮	১০৪·৮	৯৩·৭	১১৮	৮১	১২০	১১৯·৩	১৫৩·৩	১০৫

উৎপাদনের এই অবনতির জন্য দায়ী করা হয় শ্রমিককে অথচ সরকারী লেবার গেজেট (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯) অনুসারে:—

আসামে ২৪টি, আজমীরে ৯টি, যুক্তপ্রদেশে ১২৬টি বোম্বাইয়ে ৪৯৯টি, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বছর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। নতুন করে আমেদাবাদে ৩০টি সূতাকল বন্ধ করা হয়েছে. পশ্চিম বাংলায় চটকলগুলিতে শতকরা ১২½টি তাঁত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মাসে এক সপ্তাহ বাধ্যতামূলক ছুটী, ৩০ হাজার পাটকল শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। কোয়েম্বাটুরে ১০ হাজার শ্রমিক বরখাস্ত হয়েছে, রেলে ৫০ হাজারের মত কর্ম্মচারী ছাঁটাই-এর তালিকায় অপেক্ষা করছে। শুধু তাই নয় ইতিমধ্যে অর্ডন্যান্স কারখানাগুলিতে মোট কর্ম্মচারীর শতকরা ২৪·২ ভাগ, এইচ-এম-আই ডকে শতকরা ২৯·৫ ভাগ বরখাস্ত হয়েছে। দেশে যে কি বিরাট বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কিছু প্রমাণ মিলবে পশ্চিম বাংলায় ৩১৪টি পদের জন্য ৫০ হাজার দরখাস্তে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত যত

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

দুই বছরের স্বাধীনতা

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রমিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে তাদের সংখ্যা হল :—

১৯৪৬—৫·৭ লক্ষ
১৯৪৭—৬·৩ „
১৯৪৮—৮·৭১ „

এই ২০·৭১ লক্ষের মধ্যে ৫·৫ লক্ষ কাজ পেয়েছে ; বাকী ১৫ লক্ষের ওপর বেকার। এই সংখ্যাকে কোনক্রমেই সম্পূর্ণ বলা যায় না যেহেতু লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আছে যারা নাম লেখায় নি। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির কি সমাধান হয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন চিহ্ন আজ নেই। বৃটিশ শাসনের আমলে যে সমস্ত অর্ডিন্যান্স ও বিশেষ আইন প্রচলিত ছিল আজ তার একটাও উঠে যায় নি এবং আরও বহু অর্ডিন্যান্স, নিরাপত্তা আইন প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে চালু করা হয়েছে। সভা সমিতির অধিকার ১৪৪ ধারার কল্যাণে বছরের মধ্যে ১১ মাস নেই বল্লেই চলে : সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একা পশ্চিম বাংলায় ২০ খানার বেশী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, কয়েকখানা দৈনিকের জামানত তলব করা হয়েছে। অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক কর্মীকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। বহু সাহিত্যিক ও প্রগতিবাদী লেখককে কংগ্রেস প্রশস্তি লিখতে বাধ্য করা হয়েছে। কতকগুলি প্রগতিবাদী চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা ও বিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে ভারতবর্ষে। অজুহাত—কম্যুনিষ্ট ভীতি ! অথচ এদের অনেকেই এবং অনেকগুলিই কম্যুনিষ্ট নয়। আর যদি কম্যুনিষ্ট হয় তা হলেও আইন আছে আদালতের অভাব নেই ; তার সাহায্যে বিচারে আপত্তি কোথায় ? কংগ্রেসের এই স্বৈরাচারী চণ্ড নীতির প্রতিবাদ কংগ্রেসী সরকারের বিচারপতিরাও করতে বাধ্য হয়েছেন। নিরাপত্তা আইনের দাপটে লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে ; নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধেই নিরাপত্তা চায় জনতা।

ধর্ম নিরপেক্ষতা

ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে নতুন করে ধর্মান্ধতা আমদানী করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ওপর থেকে বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে ; হিন্দুমহাসভা ও মোসলেম লীগের এককালের মাতব্বর ব্যক্তিরা আজ কংগ্রেসের প্রধান পাণ্ডা। নির্ব্বাচনে পর্য্যন্ত এদেরই সমর্থন জানান হচ্ছে। কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে তারই স্থান হবে যে সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রদায়িকতার বড় প্রচারক হবে। বোম্বাই নির্ব্বাচনে তার প্রমাণ মিলেছে।

আই সি এস, আই পি এস এর দল

ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভ ছিল এই সব আমলাতন্ত্রীর দল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পৈশাচিক উৎপীড়ন এদের প্রায় প্রত্যেকেরই চাকুরী-জীবনে উন্নতির একমাত্র সোপান। আর সেই উৎপীড়ক আমলাতন্ত্রীর দলই আজকে নেতাদের চোখে দেশসেবকের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। দীর্ঘ দিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহন করে যে জনস্বার্থ বিরোধীতার ঐতিহ্য এরা শিক্ষা করেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাদের সে দীর্ঘ দিনের অভ্যাস রাতারাতি রূপান্তরিত হয়ে জনতার প্রতি অকৃত্রিম দরদে পরিণত হয়ে গিয়েছে এই ধরণের চিন্তা পাগল কিংবা ধনতন্ত্রের দালালদের পক্ষেই সম্ভবপর। চাকুরীতে উন্নতির জন্য যে নেতাদের এরা নিষ্পেষণ করেছিল তাঁদের প্রতি এদের ভক্তি শ্রদ্ধা দেখে দিনেও জনতার প্রতি যে এদের ব্যবহারের কোন পরিবর্তন ঘটে নি তা অসংখ্য ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্টি, তারই স্বার্থরক্ষী আই সি এস, আই পি এসের দলের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখতে পারায় কৃতিত্বত কিছুই নেই বরং তা লজ্জার বিষয়।

এই সব বিচার বিশ্লেষণ করার পর ১৫ই আগষ্টের যে স্বাধীনতার achievement সম্বন্ধে এত গালভরা প্রচার চালান হয়েছিল তার মূল্য কতটুকু তা জনতার বুঝতে কষ্ট হবে না। সুতরাং স্বাধীনতার মোহ বন্ধ হতে মুক্ত হয়ে কংগ্রেসবিরোধী সংগ্রামী বামপন্থী গণফ্রন্ট গঠন করে পুঁজিবাদকে উৎখাত করে জনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই হল বর্ত্তমানের ঐতিহাসিক কর্তব্য।

'সমাজতন্ত্রী' জয়প্রকাশের শ্রমিক দরদের নমুনা

পুলিশ ডাকিয়া শ্রমিককে গ্রেপ্তার করাইবার চেষ্টা

গত ১৮ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে জয়প্রকাশ নারায়ণের সভাপতিত্বে ডাক ও তার কর্মচারীদের এক সভা হয়। সভায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনেকেই বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাদের স্বার্থ সম্পর্কীয় অনেকগুলি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ডাক ও তার বিভাগের লোয়ার গ্রেড কর্মচারীদের সম্বন্ধে একটি কথাও সভায় আলোচিত না হওয়ায় লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড হারাণ বিশ্বাস উক্ত কর্মচারীদের তরফ হইতে কিছু বলিবার অনুমতি সভাপতির নিকট চান। অনুমতি মেলে ; কিন্তু সভাপতি মহাশয় নিজের বক্তৃতা সারিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিতে চান। কমরেড বিশ্বাস এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে জয়প্রকাশ নারায়ণ পুলিশ ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দিবার ভয় দেখান এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পুলিশ ডাকিতেও ছুটেন। ইহাতে সভায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তুমুল গণ্ডগোলের মধ্যে সভা ভাঙ্গিয়া যায়।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভা

কমরেড সাধারণ সম্পাদকের জ্বালাময়ী বক্তৃতা

শোষিত জনমানবের দুঃখের অবসান পঞ্চায়েতীরাজেই একমাত্র সম্ভব, শুধু সরকার পালটাইয়া সমাধানের কথা যাহারা বলে তাহারা ফ্যাসিবাদেরই দালাল

গত ২৮শে আগষ্ট সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পশ্চিমবঙ্গীয় কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণদাবীর প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী।

"যতদিন পুঁজিবাদ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন ফ্যাসিবাদের মৃত্যু নাই, নব নব রূপে তাহার আবির্ভাব ঘটিবে ; তাই ফ্যাসিবাদের মূলোচ্ছেদের জন্য পুঁজিবাদের ধ্বংস অপরিহার্য্য। শুধু সরকার পালটাইয়া পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হয় না, তাহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন, তাহার জন্য প্রয়োজন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। মেহনতী জনসাধারণের দুঃখের অবসান পঞ্চায়েতীরাজেই একমাত্র সম্ভব। তাহার দ্রুত প্রস্তুতির জন্য জনসাধারণকে একদিকে পরিষদে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে অন্যদিকে পরিষদের বাহিরে গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

উক্ত সভায় কমরেড সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষ এই মন্তব্য করেন। তিনি ফ্যাসিবাদ কি, তাহার বর্ত্তমান দ্বৈতরূপ, রাষ্ট্র ও সরকারের প্রভেদ, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট, ভারতীয় রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী রূপ এবং কিভাবে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিয়া পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহা বিষদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। ইহার পর বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড নীহার মুখার্জী গণ-কমিটি কি এবং তাহা গঠন করা কেন বর্ত্তমানে জনতার ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য তাহা বিবৃত করেন। সভায় বিশিষ্ট কৃষক নেতা ও যুক্ত কিষাণ সভার পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সহঃ সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, ডাক তার লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ এসোসিয়েশনের নেতা কমরেড হারাণ বিশ্বাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সর্বশেষে কমরেড সভাপতি আবেগময়ী ভাষায় কংগ্রেসী দুঃশাসনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ও জনতাকে আবার সংঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাকে ধ্বংসের আহ্বান দিয়া সভা শেষ করেন।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ১।এ একজিবিশন রো, কলিকাতা—১৭ হইতে প্রকাশিত।